বর্ষবরণ
?

শরীফা খাতুন

বর্ষবরণ

শরীফা খাতুন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬৭
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

১ম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১৬ খৃ.

২য় সংস্করণ
জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি.
ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
১৫ (পনের) টাকা মাত্র

Barsha Boron by **Shareefa khatun**, Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, দিন ও রাত্রির আগমন-নির্গমন এবং সারা বছরের ঋতু বৈচিত্র্য সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে বান্দার কোন হাত নেই। তাই সৃষ্টির বদলে স্রষ্টার ইবাদত করাই বান্দার প্রধান কর্তব্য। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে যামানাকে গালি দেয়, অথচ আমিই যামানার সৃষ্টিকর্তা। আমার হাতেই সকল কর্তৃত্ব। আমি রাত্রি ও দিবসের বিবর্তন ঘটাই' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২২)*। তাই বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ, চৈত্রসংক্রান্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠান সমূহ ইসলামী আক্বীদার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ এগুলিতে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকে পূজা করা হয়। যা স্পষ্ট শিরক।

যুগ যুগ ধরে এদেশে হিন্দু-মুসলিম একত্রে সহাবস্থান করছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব উৎসব-আনন্দ করে থাকে। হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বণ হয়ে থাকে। মুসলমানদের দুই ঈদে আনন্দ-উৎসব হয়ে থাকে। কেউ কারো ধর্মীয় উৎসবকে নিজেদের বলে দাবী করেনি। বরং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে পৃথকভাবে স্ব স্ব ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহ পালন করে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে হিন্দুদের পালিত নানা পর্ব ও উৎসবকে 'সার্বজনীন জাতীয় উৎসব' হিসাবে দাবী করা হচ্ছে এবং তাতে মুসলমানদের অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাধ্য করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যা নিতান্তই অন্যায়। বরং এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। দুর্বল চেতনার মুসলমানরা ক্রমেই অমুসলিমদের বিভিন্ন শিরকী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এ থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে রক্ষা করা আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

হিন্দুদের পালিত বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে 'বর্ষবরণ' অন্যতম একটি ধর্মীয় উৎসব। অত্র বিষয়ে লেখিকা শরীফা খাতুন-এর নিবন্ধটি মাসিক 'আত-তাহরীক' ১৮তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর'১৪-এর 'মহিলাদের পাতা'য় প্রকাশিত হয়। লেখাটি 'গবেষণা বিভাগ' কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। লেখাটির জন্য সম্মানিতা লেখিকা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে শিরকের প্রতি ঘৃণা ও তাওহীদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হৌক এটাই আমাদের একান্ত কামনা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'-এর গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

পহেলা বৈশাখ ‘বর্ষবরণ’। এটা নাকি একমাত্র অসাম্প্রদায়িক মহোৎসব। যেখানে নেই কোন ধর্মের ভেদাভেদ, নেই জাত-পাতের পার্থক্য। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তারা চান সকল ধর্মের সাথে মিলেমিশে খিচুড়ী মার্কা একটা উৎসবের। যে উৎসব সকলের মধ্যকার ছেদ-পার্থক্য দূর করে একাকার করে দিবে। ভেঙ্গে দিবে ধর্মের প্রাচীর। এই সাথে প্রবেশ করানো হয়েছে রাজনীতি। যারা বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ভেঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাথে মিশে ভারতের সাথে একাকার হয়ে যেতে চান। তাদের মুখে বারবার শোনা যায় ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’র মেলবন্ধনের কথা। তাহ’লে অসাম্প্রদায়িক শব্দটি দিয়ে তারা কী বুঝাতে চান? আসুন! একবার পিছন ফিরে দেখা যাক।

বাংলা সনের উৎপত্তি :

মোঘল সম্রাটদের শাসনকার্য হিজরী সন অনুযায়ী পরিচালিত হ’ত। এতে খাজনা আদায়ে অসুবিধা দেখা দিত। কারণ চান্দ্রবর্ষ প্রতি বছর ১০/১১ দিন এগিয়ে যায়। ফলে ফসল ওঠা ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর সৌরবর্ষের হিসাবে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।[১]

সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মোতাবেক হিজরী ৯৬৩ সালের মুহাররম মাসে। তখনও বঙ্গে শকাব্দ চালু ছিল। যার শুরুর মাস ছিল চৈত্র। শকাব্দ হ’ল মধ্য এশিয়ার প্রাচীন রাজা ‘শক’ কর্তৃক প্রবর্তিত সাল।

আকবরের সিংহাসনারোহণের মাস মুহাররমের সাথে শকাব্দের বৈশাখ মাস পড়ে যাওয়ায় তিনি ফসলী সন শুরু করেন বৈশাখ মাস দিয়ে। সেই থেকে চৈত্রের পরিবর্তে বৈশাখ দিয়ে শুরু হয় বাংলা নববর্ষ।

পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ১৯৬৬ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে প্রধান করে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা সনের সংস্কার সাধন করেন। যেখানে বছরের প্রথম পাঁচ মাস বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়,

---

১. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ই এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৭।

শ্রাবণ ও ভাদ্র গণনা হবে ৩১ দিনে। পরের সাত মাস আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র গণনা হবে ৩০ দিনে। অতঃপর ইংরেজী লিপ ইয়ারে বাংলা ফাল্গুনের সাথে ১ যোগ হয়ে ৩১ দিনে হবে।

এই সংস্কারের ফলে এখন প্রতি ইংরেজী বছরের ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নেতারা এ সংস্কার গ্রহণ করেননি। ফলে তাদের ১লা বৈশাখ হয় আমাদের একদিন পরে।

ইংরেজী সনের বর্তমান রূপ :

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকোতে এক উচ্চমানের সভ্যতা ছিল। যার নাম 'মায়া সভ্যতা'। সংখ্যাতাত্ত্বিক জ্ঞান ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে মায়াদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তারাই প্রথম আবিষ্কার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন।

বলা হয়ে থাকে, নিজেদের গণনার সুবিধার্থে সর্বপ্রথম রোমানরা ক্যালেণ্ডার তৈরী করে। তাতে বছরের প্রথম মাস ছিল মারটিয়াস। যা বর্তমানে মার্চ মাস। এটি তাদের যুদ্ধ দেবতার নামানুসারে করা হয়। অতঃপর খৃষ্টপূর্ব ১ম শতকে জুলিয়াস সিজার কয়েক দফা পরিবর্তন ঘটান ক্যালেণ্ডারে। তৎকালীন প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনিই প্রথম সেখানে (মায়াদের আবিষ্কৃত সূর্যকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকাল) ৩৬৫ দিন ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার উদ্ভাবিত 'জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার' বাজারে প্রচলিত থাকে। বহুকাল পরে এই ক্যালেণ্ডার সংশোধন করে নতুন একটি ক্যালেণ্ডার চালু হয়। দু'জন জোতির্বিজ্ঞানীর সাহায্যে খৃষ্টধর্মের ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরী ১৫৭৭ সালে জুলিয়াস প্রবর্তিত প্রচলিত ক্যালেণ্ডারটিতে পরিবর্তন আনেন। অবশেষে ১৫৮২ সালে আরেক দফা সংস্কার করে বর্তমান কাঠামোতে দাঁড় করানো হয়। পরিবর্তিত এ ক্যালেণ্ডারে নতুন বর্ষের শুরু হয় জানুয়ারী দিয়ে, যা গ্রীকদের আত্মরক্ষার দেবতা 'জানুস'-এর নামে করা হয়। আমাদের ব্যবহৃত বর্তমান ইংরেজী ক্যালেণ্ডারটি 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার'। প্রায় সারাবিশ্বে প্রচলিত ইংরেজী ক্যালেণ্ডার এখন এটিই।

ইংরেজী বর্ষবরণ হয় যেভাবে :

ইংরেজী নববর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে পালিত হয়। আমেরিকাতে হয় সবচেয়ে বড় নিউইয়ার পার্টি, যেখানে হাযার হাযার লোক অংশগ্রহণ করে। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুরূপ অনুষ্ঠানে হাযার হাযার আতশবাজি

ফুটানো হয়। মেক্সিকোতে ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২-টা বাজার সাথে সাথে ১২-টা ঘণ্টা ধ্বনি বাজানো হয়। প্রতিটি ঘণ্টা ধ্বনিতে ১টি করে আঙ্গুর খাওয়া হয়। আর মনে করা হয়, যে উদ্দেশ্যে আঙ্গুর খাওয়া হবে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে। ডেনমার্কে আরো লঙ্কাকাণ্ড! ডেনিশরা প্রতিবেশীদের দরজায় কাঁচের পাত্রসমূহ ছুঁড়তে থাকে। তাদের বিশ্বাস যার দরজায় যতবেশী কাঁচ জমা হবে, নতুন বছর তার তত ভাল যাবে। আর কোরিয়ানরা যৌবন হারানোর ভয়ে এ রাতে ঘুম থেকে বিরত থাকে। তাদের বিশ্বাস বছর শুরুর সময় ঘুমালে চোখের ভ্রু সাদা হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাংলাদেশেও রাত ১২-টা বাজার সাথে সাথে আতশবাজি, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। নতুন পোশাক, ভাল খাবার, বিভিন্ন স্পটে ঘুরতে যাওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদির মধ্যদিয়ে পালিত হয় ইংরেজী নববর্ষ।

বাংলা বর্ষবরণ হয় যেভাবে :

বাংলাদেশে বৈশাখ বরণের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। ইংরেজী নববর্ষের চেয়ে বাংলা নববর্ষ এখানে অনেক বেশী সাড়ম্বরে পালিত হয়। সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ছায়ানট’[২]-এর শিল্পীরা রমনা বটমূলে রবীন্দ্রনাথের গান এবং ধানমণ্ডি রবীন্দ্র সরোবরে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে নববর্ষের সূচনা করে। বাংলা নববর্ষে সূর্যোদয়ের সময়টিকে কল্যাণের জননী হিসাবে বেছে নিয়ে সূর্যকে আহ্বান করা হয়। পহেলা বৈশাখ শুরু হয় ভোরে সূর্যোদয়ের পর পর। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩১ চৈত্র; চৈত্র সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তি মানে চৈত্রের শেষদিন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চৈত্রকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা রমনার বটমূলে বিশ্বকবির বৈশাখী গান ‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...’ গেয়ে সূর্যবরণের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

রমনার বটমূল হচ্ছে পহেলা বৈশাখের ধমনী। যে গাছের ছায়ায় ছায়ানটের মঞ্চ তৈরী হয় সেটি আসলে বট গাছ নয়। অশ্বত্থ গাছ। সুতরাং ‘বটমূল’ নয় ‘অশ্বত্থমূল’। বটমূল হল প্রচলিত ভুল শব্দের ব্যবহার।

---

২. ১৯৬৪ সাল মোতাবেক ১৩৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ রমনার বটমূলে সর্বপ্রথম ‘ছায়ানট’ বাংলা নববর্ষ পালন শুরু করে। যদিও এটি হবে অশ্বত্থমূলে। কারণ সেখানে কোন বট গাছ নেই। বরং একটি অশ্বত্থ গাছ আছে।- প্রকাশক।

Contents

মঙ্গল শোভাযাত্রা :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে বের হয় বৈশাখের মিছিল। দেশের সমৃদ্ধি ও নববর্ষের শুভ কামনায় এটি বের হয় বলে এর নাম হয়েছে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। হাযার হাযার মানুষের অংশগ্রহণে মূর্তি ও মুখোশের মিছিলে ঢাক-ঢোল, কাঁসা-তবলার তালে তালে চলতে থাকে সঙ্গীত-নৃত্য, উল্লাস-উন্মত্ততা। লক্ষণীয় যে, মঙ্গল শোভাযাত্রার মঙ্গল কামনার প্রতীক হল চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীদের ম্যাসব্যাপী পরিশ্রমে বানানো হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, পেঁচা, পুতুল, পাখি, মূর্তি, বিভিন্ন মুখোশ। ১৯৮৬ সালে সর্বপ্রথম যশোরে এ শোভাযাত্রার প্রচলন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউটের কিছু ছাত্র যশোর 'চারুপীঠ' নামের একটি সংস্কৃতিশালা গড়ে তোলে। চারুপীঠের উদ্যোগে প্রদর্শিত এ শোভাযাত্রায় উদ্যোক্তারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফুল-পাখি, ভূত-প্রেত-দানব, ও জীব-জন্তুর রেপ্লিকা-মুখোশ ব্যবহার করে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে ১৯৮৮ সালে এ শোভাযাত্রা প্রথম বের হয়। তাতে ব্যবহৃত হয় চারু শিল্পীদের তৈরী দশটি ছোট আকৃতির ঘোড়া, একটি বিরাটাকার হাতি, (যাকে হিন্দুরা গণেশ বলে পূজা করে) এছাড়া ৫০টি মুখোশ।

ইলিশ-পান্তার সূচনা :

সবকিছু ছাপিয়ে ইলিশ-পান্তা হয়ে উঠেছে এখন বৈশাখের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ঠিক ইট-বালুতে সিমেন্টের ন্যায়। পান্তা-ইলিশ বিহীন বৈশাখের গাথুঁনী যেন বালুময়। বৈশাখে পান্তা-ইলিশের সংযোজনকারীদের অন্যতম সাইফুল্লাহ মাহমূদ দুলাল নিজেই উল্লেখ করেছেন কিভাবে তারা এর সূচনা করেন। তিনি বলেন, ৫নং সেগুনবাগিচার বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ছিল 'দৈনিক দেশ' ও 'সাপ্তাহিক বিপ্লব' পত্রিকার কার্যালয়। সেখানে বসত লেখক আড্ডা। আমি ছিলাম একজন নিয়মিত আড্ডারু। ১৯৮৩ সাল। চৈত্রের শেষ। চারদিকে বৈশাখের আয়োজন চলছে। আমরা আড্ডা দিতে দিতে পান্তা-পিঁয়াজ-কাঁচা মরিচের কথা তুলি। দৈনিক দেশের (প্রয়াত) বোরহান ভাই রমনা বটমূলে পান্তা-ইলিশ চালুর প্রস্তাব দিলেন। আমি সমর্থন দিলাম। প্রথমে আমাকে দায়িত্ব নিতে বললেন। কারণ সেই আড্ডায় আমিই একমাত্র বহিরাগত। ফলে কাজটা সম্পাদন করতে সুবিধা হবে। আমি একা রাজি না হওয়ায় কবি ফারূক মাহমূদ আমাকে নিয়ে পুরো আয়োজনের

ব্যবস্থা করলেন। নিজেদের মধ্যে পাঁচ টাকা করে চাঁদা তোলা হ'ল। বাজার করা আর রান্না-বান্নার দায়িত্ব দেওয়া হল 'বিপ্লব' পত্রিকার পিয়নকে।

প্রথমে আমরা পান্তা আর ডিম ভাজা দিতে চাইলাম। কিন্তু ডিমের স্থলে স্থান পেল জাতীয় মাছ ইলিশ। রাতে ভাত রেঁধে পান্তা তৈরী করে, কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ, ইলিশ ভাজা নিয়ে 'এসো হে বৈশাখে'র আগেই ভোরে আমরা হাজির হ'লাম বটমূলের রমনা রেষ্টুরেন্টের সামনে। সঙ্গে মাটির সানকি। মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে গেল পান্তা-ইলিশ। এভাবে যাত্রা শুরু হলো পান্তা-ইলিশের।[৩]

ইলিশ নিধন :

চীন সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, আরব সাগরে যেমন ইলিশ ধরা পড়ে, তেমনি মিয়ানমার, পাকিস্তান ও ইরাকেও রয়েছে ইলিশ। কিন্তু বাংলার ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। অপরিণত ইলিশ দিয়ে বর্ষবরণ করতে গিয়ে ইলিশের ঐতিহ্য আজ শেষ হওয়ার পথে। দেশীয় ঐতিহ্য ও সম্পদের ক্ষতি যাই হোক ইলিশ খেয়ে বাঙালী হওয়া চাই। ইলিশের উপর এই খড়্গ নেমে আসায় ভোগবাদীদের ভোগের কমতি না হলেও দেশের ক্ষতি অনেক।

উল্লেখ্য যে, একটি পরিপূর্ণ মা ইলিশের পেটে অন্তত ১০ লাখ ডিম থাকে। এ সংখ্যা আকার ও স্বাস্থ্য ভেদে ২০ লাখ পর্যন্ত হ'তে পারে। একটি মা ইলিশ বা একটি জাটকা নিধন করার মানে হ'ল ১০-২০ লাখ ইলিশকে আগাম ধ্বংস করা। ১৯৮৫-এর মৎস রক্ষণ ও সংরক্ষণ বিধির ৯নং ধারা অনুযায়ী (এরপর আর আইন সংশোধন হয়নি)। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ২৫ সে.মি. দৈর্ঘের নীচে ইলিশ ধরা ও বহন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হচ্ছে ইলিশের প্রজনন মৌসুম। আর মার্চ-এপ্রিল জাটকা মৌসুম। এপ্রিল মাস পার হ'লে আর জাটকা থাকে না। তখন মোটামুটি সব জাটকা পূর্ণ ইলিশ হয়ে যায়, স্বাদ বাড়তে থাকে কিন্তু ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ হওয়ায় জাটকা আর খুব একটা পূর্ণ ইলিশ হ'তে পারে না।

ইলিশ রফতানী করে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করে।[৪] ১৯৯৬-৯৯ পর্যন্ত এ অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি টাকা। এখন তো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পরিণত প্রকৃত ইলিশের স্বাদ পায় না।

---

৩. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ই এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১।

৪. বাংলাদেশের জিডিপিতে অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ে এককভাবে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ *(দিগদর্শন-২ পৃ. ১০১)*।- প্রকাশক।

ইলিশ ফ্যাশনে পহেলা বৈশাখ পালন করতে গিয়ে বাঙ্গালীদের এগুলো দেখার সময় কোথায়? উল্লেখ্য, প্রায় ৪ দশক লোকসানের পর ২০১৬ সালে সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে বর্ষবরণে ইলিশ বর্জন করা হয়েছে ও ইলিশ রক্ষার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাতে কিছুটা হলেও ইলিশের স্বাদ গন্ধ ফিরে আসার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

বর্ষবরণে পণ্য : বর্ষবরণ উদযাপনের জন্য বিশেষ পোষাক, গয়না, প্রসাধনী থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদিতেও ব্যাপক সয়লাব দেখা যায়। এতসব কেনাকাটা করতে ঘরের কর্তাপুরুষও দিশেহারা। পত্রিকায় প্রকাশ বৈশাখ উপলক্ষে সম্ভাব্য লেনদেন ১২ হাযার কোটি টাকা। যেসব পণ্য শুধুই উৎসব সর্বস্ব। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। যেহেতু বৈশাখ উদযাপন বৈধ নয়, এ উপলক্ষে কেনাকাটাও স্বীকৃত নয়। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ– ‘নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা কর না’ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

বৈশাখে হিন্দু সংস্কৃতি :

সংস্কৃতি বলতে কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুনকে বুঝায়। আরো সহজে বললে সংস্কৃতি দ্বারা সামাজিক রেওয়াজ, প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। জীবনধারা ভিন্ন হ’লে সংস্কৃতিও ভিন্ন হয়। যেমন- একজন হিন্দু তাদের কোন মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে সৎকার করে। এটা তাদের সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে একজন মুসলমান তাদের মাইয়েতকে গোসল করিয়ে জানাযা পড়িয়ে দাফন করে। এটা মুসলমানদের সংস্কৃতি।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে না। ইসলামে একজন মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে কেবল ইসলামী অনুশাসন মেনেই। সুতরাং মুসলিম হিসাবে একজন মানুষের জন্য ইসলামই তার একমাত্র সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী একই। তবে একেবারে জাগতিক বিষয় যেমন চাষাবাদ, বাজার-ঘাট, সমাজ-সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে দেশজ সংস্কৃতি থাকতে পারে।

ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক কোন প্রথা ইসলামী সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মুসলিম সমাজে এ ধরনের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটলে এটিকে মুসলিম সংস্কৃতি বলা যায় না। কেউ কেউ চর্চা করলেও এটি

মুসলমানদের জন্য দলীল নয়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি দেখ না তিনি কিভাবে উপমা বর্ণনা করেন? পবিত্র বাক্য হ'ল পবিত্র বৃক্ষের মত। যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা আকাশে উত্থিত' *(ইবরাহীম ১৪/২৪)*। ইসলামী শরী'আত একটি বিশাল বৃক্ষের ন্যায়। যার শিকড় মাটির গভীরে থাকে মযবুতভাবে। আর শাখা-প্রশাখা থাকে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মনে মযবুতভাবে শিকড় গাড়লে ভিন্নধর্মী মানুষের মনেও তার শাখা-প্রশাখার সজীবতা বিস্তার করবে এটাই ইসলামী সংস্কৃতির দাবী।

অথচ ১লা বৈশাখে হিন্দু সংস্কৃতির সয়লাব দেখা যায় ব্যাপকভাবে। এদিনে হিন্দুরা চড়কপূজা করে অতীতের পাপ মোচনের আশায়। নববর্ষের কালার কোড নাকি লাল সাদা। যা দুর্গা ভক্তদের প্রতীক। সূর্যকে আহ্বান, মঙ্গল শোভাযাত্রা, চৈত্রের শেষে ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন করে সোনা-রূপার পানি অথবা দুধ মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে দেয়া, যাতে বাড়িতে অকল্যাণ প্রবেশ না করে। এদিন বলী খেলা, কুস্তি খেলার আয়োজন হয় আরাধনার উদ্দেশ্যে ও বলবান মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। বিজু বা বিহু উৎসব পালিত হয় অধিক ফলন ও প্রাকৃতিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। বৈশাখী উৎসবে যুবক-যুবতীরা 'জলকেলি' (পানিতে নেমে গোসল) ও পানি ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে পসন্দ করে ও সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় ইত্যাদি অসংখ্য কুসংস্কার চালু আছে পহেলা বৈশাখকে ঘিরে।[৫]

সচেতন পাঠক! এছাড়াও অগণিত কার্যক্রম রয়েছে যা হিন্দু ও উপজাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা কোন মুসলমান নিজেদের বিনোদন হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। এরপরও তারা বলেন, বৈশাখী কার্যক্রমে নাকি বৈশাখ বিরোধীরা হিন্দুয়ানী ও ইসলাম বিরোধী বিষয়ের গন্ধ পান। গন্ধ কেন? বৈশাখের পুরা আপাদমস্তক তো হিন্দুয়ানী কুফরীতে ভরা।

বলা হয়ে থাকে, পহেলা বৈশাখ পালন না করলে বাঙালি হওয়া যায় না। কথাগুলো যারা বলেন তাদের অধিকাংশই দেশী পণ্য ব্যবহার করেন না। পেষ্ট-ব্রাশ থেকে শুরু করে সবই তাদের বিদেশী ব্রান্ডের হওয়া চাই। সুযোগ পেলে তারা শপিংয়ের জন্য বিদেশের উন্নত মার্কেটে পাড়ি জমান। তারাই আবার বৈশাখ এলে চুটিয়ে বাজার করে বাঙালি হওয়ার ধ্যানে মজেন। এসবের সঙ্গে বৈশাখের বা বাঙালি হওয়ার কী সম্পর্ক আছে? সম্পর্ক আছে

---

৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ই এপ্রিল ২০১৬।

বরং ভোগবাদের। সারা বছর যারা দেশী পণ্য ও ব্যবসা কোম্পানীর দিকে চোখ দেয়ার সময় পান না, আগ্রহবোধ করেন না, তারা আবার একদিনের বাঙালি হ'তে আসেন, বাঙালী সংস্কৃতির চর্চা করতে বলেন। আর এ দেশের নিরীহ মানুষগুলো, যারা কিনা বিদেশী কোম্পানীর পণ্য সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলেন, তারাই নাকি বাঙালি নন। ধিক এসব চিন্তা-চেতনার।

বৈধ পন্থায় বর্ষবরণ (?) :

পত্রিকায় কোন কোন কলাম লেখক লিখেছেন যে, নববর্ষ হালাল না হারাম তা নির্ধারিত হবে- তা কিভাবে উদযাপিত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে। এমনকি বৈশাখী অপসংস্কৃতি থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য তারা বৈধ উপায়ে নববর্ষ উদযাপনের পদ্ধতি বের করার দাবী জানান। অন্তর আহত হয় যখন আমরা দেখি কোন খতীব বা আলেম শ্রেণীর মানুষ এই সুরে কথা বলেন। এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জনৈক আলেম বৈধ পন্থায় বৈশাখ উদযাপনের একটা গাইড লাইনও তুলে ধরেছেন। যেমন- শুকরিয়ার নামায আদায়, দান-ছাদাক্বা, নফল রোযা, কুরআন তিলাওয়াত ও দো'আ মাহফিলের মাধ্যমে নববর্ষ উদযাপন করা। অভাবীর অভাব পূরণ, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করা, নিরক্ষরের হৃদয়ে অক্ষরের আলো জ্বেলে বা দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েও নববর্ষ উদযাপনের পরামর্শ দেন তিনি।[৬]

আরো বলা হয়, যেহেতু কৃষিকাজ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে হিজরী সন থেকে বাংলা সনের উৎপত্তি সেহেতু বাংলা সনের সাথে ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং চিন্তা-চেতনা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাই বাংলা সন উদযাপনে ইসলামী দৃষ্টিকোণ পরিহার করা মূলতঃ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতারই নামান্তর। একইভাবে বাংলা, ইংরেজী নববর্ষ পালনের পাশাপাশি হিজরী নববর্ষ পালনেরও আহ্বান জানানো হয় (পূর্বোক্ত)। আমরা বলব, যার মূলটা (অর্থাৎ দিবস পালনের বৈধতা) শরী'আত অনুমোদন করেনি, তার লতা-পাতার (অর্থাৎ কার্যক্রম) অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যার ভিত্তিই শরী'আতে নেই তার ভাল কাজই কি আর মন্দ কাজই কি? তারা বলেন, হিজরী সাল হালাল হলে বাংলা সাল নয় কেন? আসলে ইসলামের বিধানের সাথে যদি মুসলমানের তাহযীব-তামাদ্দুন মিলে যায় তবেই তা গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। একজন মুসলমান পরিচালিত হবে

৬. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১২ই এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৪।

কুরআন-সুন্নাহ্‌র দ্বারা, অন্য মুসলমানের আমল দ্বারা নয়। মূলকথা হচ্ছে আজ সারা বিশ্বের মুসলমান একযোগেও যদি দিবস পালন, বর্ষবরণ ইত্যাদি হালাল মনে করে তবু তা হালাল নয়। যেহেতু তা শরী'আত অনুমোদিত কোন অনুষ্ঠান নয়। সুতরাং বৈধ পন্থায় বর্ষবরণের চিন্তাটাই অনর্থক।

প্রিয় পাঠক! বৈশাখী অনুষ্ঠানের শুরুটাতেই হয়ত টের পেয়েছেন যে, এটি হ'ল সূর্যপূজা। এছাড়া বিনোদনের নামে পালনীয় কার্যক্রমেও হয়তো লক্ষ্য করেছেন হিন্দু কালচারের অবাধ বিচরণ। তারা বাঙ্গালী হ'তে গিয়ে হিন্দু রীতির লৌহ নিগড়ে নিজেদের আবদ্ধ করে অসাম্প্রদায়িক হ'তে চাইছেন। অসাম্প্রদায়িকতাটা কি? এটি কি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতা? যদি তাই হয়, তবে দুর্ভাগ্য মুসলমানদের, যারা নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষ ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির ধারক-বাহক সেজেছেন।

জাতীয় উৎসব হিসাবে স্বীকৃতি :

১৯৭২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পহেলা বৈশাখকে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন এবং জাতীয় উৎসব হিসাবে স্বীকৃতি দেন। দেশের সব জাতির সমন্বিত উৎসবের নাম জাতীয় উৎসব। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যা সকলেই পালন করেন। কিন্তু একজন প্রকৃত মুমিন কখনো এমন উৎসব কল্পনাও করতে পারে না। কারণ এর আড়ালে লুকিয়ে আছে বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচার।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে বিধর্মীদের প্রচলিত দু'টি উৎসব বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ– 'এই দুই দিনের পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দু'টি দিন আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। সে দু'টি হ'ল- ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর'।[৭] সব ধর্মের অংশগ্রহণে উৎসব বৈধ হ'লে রাসূল (ছাঃ) মদীনাবাসীর প্রচলিত উৎসবকে বর্জন করে মুসলমানদের জন্য নতুন উৎসব প্রবর্তন করতেন না। তিনি ঘোষণা করলেই পারতেন 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। অথচ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আর বিধর্মীদের অনুষ্ঠানে মুসলমানদের অংশগ্রহণের অর্থ হ'ল- তাদের কুফরী কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকা। যা করতে আল্লাহ নিষেধ

---

৭. আবুদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।

করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। সুতরাং পহেলা বৈশাখের ক্ষেত্রে ‘জাতীয় উৎসব’ পরিভাষাটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ইসলামী মূল্যায়ন

ইসলামে দিবস পালনের বৈধতা :

দিবস পালনের কোন বিধান ইসলামে নেই। সেটি থাকলে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু, নুযূলে অহি, মি‘রাজে গমন, মদীনায় হিজরত, বদর যুদ্ধ, মক্কা বিজয় ছাড়াও চার খলীফা ও বড় বড় ছাহাবীগণের জন্ম ও মৃত্যু, যুদ্ধ বিজয় প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করে দিবস পালন করলে বছরের ৩৬৫ দিনেও কুলাতো না। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণী যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে দিবস পালনের নির্দেশ দেননি। দিবস পালনের কোন প্রমাণ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সোনালী যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি সমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে থাকে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিবাদ না করে। আর তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত’ *(হজ্জ ২২/৬৭)*। এখানে مَنْسَكًا শব্দের অর্থ ইবাদত-অনুষ্ঠানের সময় বা স্থান। মুসলিম জীবনে ইবাদত অনুষ্ঠান যা-ই হোক না কেন তার জন্য রয়েছে এলাহী নির্দেশনা। সুতরাং কখন, কোথায়, কোন অনুষ্ঠান করতে হবে তাও আসবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। যেমন তিনি বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমরা পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি’ *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হ’ল যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য পৃথক পৃথক উৎসব ছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর জন্যও পৃথক উৎসব ছিল। কিন্তু তার উম্মতের সকলে যেমন দ্বীন মেনে নেয়নি, তেমন উৎসবও মেনে নেয়নি। ফলে নানাবিধ মনগড়া উৎসব চালু হয়েছে মুসলিম সমাজে।

অন্য ধর্মে যেখানে উৎসবকে প্রবৃত্তির অনুসরণ, অশ্লীলতা, উন্মাদনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়, সেখানে মুসলমানদের উৎসবকে ইবাদত ও সুন্নাতের

মধ্য দিয়ে পালন করতে হয়। আল্লাহ্র আদেশ মোতাবেক টানা এক মাস ছিয়াম সাধনার পর পবিত্র 'ঈদুল ফিৎর' উদযাপন বিরাট আনন্দের। তেমনি যিলহজ্জের প্রথম দশকের নফল ইবাদত ও আরাফার ছিয়ামের পর ১০ই যিলহজ্জ পশু যবহের মধ্য দিয়ে 'ঈদুল আযহা' উদযাপন বিরাট ত্যাগ ও উপভোগের। এলাহী উৎসবের আবেদন এখানেই।

মুসলিম সমাজে প্রথম দিবস পালন :

আরবে দিবস পালনের কোন রেওয়াজ পূর্বে ছিল না। পরবর্তীতে পারসিক অগ্নিপূজারী ও বাইজান্টাইন খ্রিষ্টানদের এবং অনারবদের ইসলাম গ্রহণের পর ধীরে ধীরে তাদের কৃষ্টি-কালচার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় দিবস পালন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। আব্বাসীয় খলীফার কট্টর শী'আ আমীর আহমাদ বিন বূইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইযযুদ্দৌলা' ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে বাগদাদে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে তাদের হিসাবে খুশীর দিন মনে করে 'ঈদের দিন' (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।[৮]

পরবর্তীতে ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর শাসনকালে ইরাকের এরবল প্রদেশের গবর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী খ্রিষ্টানদের বড় দিন উৎসবের পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য ৬০৫ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদুন্নবী উৎসবের সূচনা করেন। যা ক্রমান্বয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই ঢুকে পড়ে মুসলিম সমাজে দিবস পালনের রেওয়াজ। এখন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, স্বাধীনতা, কারাভোগ, কারামুক্তি, বাবা,

---

৮. হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম' বই থেকে।

মা, নারী, শ্রমিক, তামাক, স্বাক্ষরতা, ভালবাসা, হাত ধোয়া দিবস ইত্যাদি অদ্ভূত সব দিবস পালনের অন্ত নেই।

উল্লেখ্য, শরী'আতের কোন বৈধতা ছাড়াই দিবস পালন যেভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে তেমনি প্রায় সকল দিবসের আবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে পড়েছে 'কেক কাটা'। প্রাচীন গ্রীসের উপাসকরা চন্দ্র দেবীর জন্মদিনে মধু ও ময়দা দিয়ে তৈরী গোল কেক নিবেদন করা থেকে যার সূচনা। প্রতিমাসে চাঁদ উঠলে পালিত হ'ত চন্দ্র দেবীর জন্ম উৎসব। কেকের উপর মোমবাতি জ্বালানো হ'ত চাঁদের প্রতীকরূপে। পরবর্তীকালে এ প্রথাটিই মানুষ নিজেদের জন্মদিনে অত্যাবশ্যকীয় এক অনুষঙ্গ হিসাবে বেছে নেয়।[৯]

বিশেষ সময়কে উদযাপন ও সূর্যকে আহ্বান :

ইংরেজী নববর্ষের শুরু হয় ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২-টা ০১ মিনিটে। আর তখন থেকেই শুরু হয় আতশবাজি, বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান ও যুবক-যুবতীর ফ্রি স্টাইল ফুর্তি। উল্লাস আর বেলেল্লাপনায় কেটে যায় সারাটি রাত। একেই বলে 'থার্টি ফার্ষ্ট নাইট' উৎসব।

রাতের গুরুত্বপূর্ণ যে সময়টিকে তারা টগবগে যৌবনের লাগামছাড়া নেশা মেটানোর সময় হিসাবে বেছে নেয়, সে সময়টিতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বান্দাকে আহ্বান করতে থাকেন। মহান স্রষ্টার আহ্বানকে উপেক্ষা করে যারা শয়তানের আহ্বানে রাত জাগে, তাদের পরিণাম আল্লাহ্র কাছে কি হবে, তা পরিষ্কার?

মঙ্গল শোভাযাত্রা :

অনেকেই জানে না এ শোভাযাত্রায় কেন মুখোশ-মূর্তি ব্যবহৃত হয়। তাতে শামিল হওয়ার ফলইবা কি? মূলতঃ এর মাধ্যমে তারা হিন্দুদের ন্যায় মূর্তি পূজা করছে? অসম্ভব শাস্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মনের অজান্তেই।

অথচ ছবি-মূর্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبِ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ 'যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে জীবন দিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তাতে সক্ষম হবে না'।[১০] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ

---

৯. ঢাকা : দৈনিক প্রথম আলো, ৬ই আগষ্ট ২০০৮, পৃ. ১১।
১০. বুখারী হা/৭০৪২; মিশকাত হা/৪৪৯৯।

بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ ‘যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না’।[১১] সুতরাং হে তরুণ ভাই ও বোনেরা! মুসলমান হয়েও তোমরা মূর্তি পূজারী হয়ো না। অন্ততঃ তোমার পরিচয়টা অক্ষত রাখ।

অনুরূপভাবে কোন বিশেষ সময়কে শুভাশুভ নির্ণয় ও তাতে বিশ্বাস স্থাপন শরী‘আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ‘কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক’।[১২] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ ‘যে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে এবং যাকে সে বিশ্বাস করায়, যে ভাগ্য গণনা করে এবং যাকে সে ভাগ্য গণনা করে দেয়, যে জাদু করে এবং যাকে সে জাদু করে দেয়- তারা আমাদের (উম্মাতে মুহাম্মাদীর) অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৩]

কোন সময়কে অশুভ বা শুভ মনে করা হিন্দু সংস্কৃতিধারী মুসলিমের কাজ। বরং বিশেষ যে সময়ের কথা হাদীছে এসেছে তা নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. ‘রাতের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মানুষ সে সময় লাভ করতে পারে, তবে আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন। আর এ সময়টি প্রতি রাতেই রয়েছে’।[১৪]

জুম‘আর দিন সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, ‘জুম‘আর দিন সকল দিনের সরদার এবং আল্লাহ্র নিকট বেশী সম্মানিত। এটা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত দিন। তাতে পাঁচটি গুরুত্ব রয়েছে। এ দিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, এ দিনেই তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়, যদি তা

---

১১. বুখারী হা/৫৯৪৯; মিশকাত হা/৪৪৮৯।

১২. আবুদাউদ হা/৩৯১২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৮৪।

১৩. ত্বাবারাণী হা/৩৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৫।

১৪. মুসলিম হা/৭৫৭; মিশকাত হা/১২২৪।

হারাম না হয়। এ দিনে ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে। এ দিনে ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র সব কিছুই ভীত থাকে।[১৫]

মুসলিম জীবনে আরেকটি বিশেষ রাত্রি রয়েছে, যাকে 'লায়লাতুল ক্বদর' বলা হয়। 'যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম' *(ক্বদর ৯৭/৩)*। এটিকে রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে অনুসন্ধান করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।[১৬] এছাড়া মুসলিম জীবনে আর কোন বিশেষ মুহূর্ত নেই- যেটাকে মানুষ অনুসন্ধান করতে পারে। বস্তুতঃ মানব জীবনের পুরো সময়টাই হীরন্ময়। যা একবার গত হ'লে আর কখনো ফিরে আসে না। বরং বিশেষ সময়কে এভাবে উদযাপন করা শিরকী সংস্কৃতি বৈ কিছুই নয়।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আবির্ভূত ইসলামকে যারা সেকেলে মনে করে, যারা ইসলামের নবায়নের জন্য মরিয়া, তারাই আবার লক্ষ-কোটি বছরের পুরোনো সূর্য ও চন্দ্র পূজাকে নিজস্ব সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে আধুনিক হওয়ার দাবী করছে। খৃষ্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় 'অ্যাটোনিজম' মতবাদে সূর্যের পূজা হ'ত। ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্যপূজারীর অস্তিত্ব রয়েছে। খৃষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব ২৫শে ডিসেম্বর 'বড় দিন' পালিত হয় মূলতঃ রোমক সূর্যপূজারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনুকরণে, যীশু খৃষ্টের প্রকৃত জন্ম তারিখ থেকে নয়।

অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হামীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*।

মূলতঃ দুই ঈদ ব্যতীত মুসলিম জীবনে আর কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। এছাড়া সংস্কৃতির নামেই হোক আর ধর্মের নামেই হোক- সব ধরনের উৎসব পরিত্যাজ্য। বৈশাখ বরণের নামে নতুন বছরের সূর্যকে সম্ভাষণ জানানো, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন, মঙ্গল শোভাযাত্রা এগুলো সবই পৌত্তলিক

১৫. ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; মিশকাত হা/১৩৬৩।
১৬. বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩।

ও সূর্যপূজারীদের ধর্মীয় আচার মাত্র। এসব অনুষ্ঠান কখনো মুসলিম সংস্কৃতির অংশ নয় বা হ'তে পারে না। কত মায়ের সন্তান যে এইসব শিরকী উৎসবে আটকা পড়েছে- তা ভাববার কেউ নেই। ধর্মহীনতার চোরাবালিতে তারা তলিয়ে যাচ্ছে। আর তারা সার্বজনীন উৎসবের নামে একতার বাণীতে শান দিচ্ছে। মেকী ঈমানের পরহেযগার ব্যক্তিরা হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে উপলব্ধি করবেন কি?

বাদ্য-বাজনার ব্যবহার :

বর্ষবরণের এসব অনুষ্ঠানে গান-বাজনা যেন পূর্বশর্ত। ঢেউ খেলানো আনন্দে বাজনা-সঙ্গীত যেন ফেনিল পানিরাশি হয়ে বয়ে চলে। অথচ বাদ্য-বাজনার ব্যবহার ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞভাবে অনর্থক কথা (বাদ্য-বাজনা) ক্রয় করে এবং তাকে আনন্দ-ফূর্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি *(লোক্বমান ৩১/৬)*।

আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقال : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন। আর তিনি বলেছেন, মাদকতা আনয়নকারী সকল বস্তু হারাম'।[১৭]

নাফে' (রাঃ) বলেন, একদিন ইবনু ওমর (রাঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে যান। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, নাফে' তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি তার দুই আঙ্গুল দুই কান হ'তে বের করে বললেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেভাবে আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।[১৮]

---

১৭. বায়হাক্বী হা/২০৭৩২; মিশকাত হা/৪৫০৩, সনদ ছহীহ।
১৮. আবুদাঊদ হা/৪৯২৪, সনদ ছহীহ।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা :

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা যেন জাহেলিয়াতকেও হার মানায়। নগ্নতার এই অপসংস্কৃতি দেশকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। যা নতুন বংশধরদের জন্য চরিত্রবান মায়ের সংকট তৈরী করছে তারা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا 'দুই শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে, যাদের আমি এখনও দেখিনি। এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরু চালনার লাঠি থাকবে। তা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়'।[১৯]

অত্র হাদীছে আঁটসাঁট, অশালীন, অমার্জিত পোষাক পরিধানকারী, মাথার চুল উপরে বাঁধা নারীদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তাদেরকে জান্নাত বঞ্চিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ 'আমি জান্নাত দেখলাম। লক্ষ্য করলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। জাহান্নাম দেখলাম। লক্ষ্য করলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসী নারী'।[২০] এরূপ বহু হাদীছ রয়েছে, যেগুলোতে অশালীন নারীর নিশ্চিত শাস্তির কথা বিধৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নারী খেল-তামাশা, উল্লাস-নৃত্য করে তার যৌবন উপভোগ করার কারণে যেমন শাস্তি পাবে, তেমনি যুবকও শাস্তি পাবে। যে পুরুষ পরিবারের দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়েন,

১৯. মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪।
২০. বুখারী হা/৩২৪১; মুসলিম হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৫২৩৪।

তাহাজ্জুদ পড়েন, নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত হন, মুখে দাড়ি রেখে ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে চলাফেরা করেন, সমাজেও ভদ্রজন হিসাবে পরিচিতি পান, কিন্তু তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে উত্তমভাবে তদারকি করেন না, নিজ নিজ গতি অনুযায়ী তারা বেপর্দা চলাফেরা করে, এমনতরো ভদ্রজনকে হাদীছে ‘দাইয়ূছ’ বলা হয়েছে। দাইয়ূছ হলো- যে ব্যক্তি তার পরিবারকে বেহায়াপনার সুযোগ দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপরে জান্নাত হারাম করেছেন; মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতার স্বীকৃতি দেয়’।[২১]

দাইয়ূছী এমন একটি পাপ- যাতে নিজে পাপ করার প্রয়োজন হয় না, অন্যের পাপ দেখে নীরব থাকলেই পাপ অর্জিত হয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি পরিবারকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন, সে কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

আনন্দের নামে অপচয় :

এছাড়াও বৈশাখী আল্পনা অংকন, বৈশাখী-পোষাক পরিধান, পান্তা-ইলিশ ভোজন, বিভিন্ন স্পটে ভ্রমণ প্রভৃতি বিনোদনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় হয়। ‘আল্পনায় বৈশাখ-১৪২১’ শিরোনামে জাতীয় সংসদের বিপরীতে মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউতে ২০১৬ সালের ১৩ই এপ্রিল রাত থেকে ১৪ই এপ্রিল ভোর পর্যন্ত আঁকা হয় দীর্ঘ আল্পনা। অথচ অপচয়ের এই টাকা যদি অন্নহীন বনু আদমের দু’মুঠো ভাতের জন্য ব্যয় করা হ’ত তাহ’লে তারা কতই না উপকৃত হ’ত! অথবা অন্য কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হ’লে তা পরকালের পাথেয় হ’ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ ‘নিশ্চয়ই দান কবরের উত্তাপকে নিভিয়ে দেয় এবং মুমিন ক্বিয়ামতের দিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে’।[২২]

২১. আহমাদ হা/৫৩৭২; মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৫২।
২২. ত্বাবারাণী হা/৭৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।

Contents

অমুসলিম সংস্কৃতিতে আমরা :

চিন্তা-চেতনা, কলা-কৌশল, কর্ম-পরিকল্পনা, উৎসব-অনুষ্ঠান ভাষা-সাহিত্য সব দিক থেকে মুসলিম হবে অমুসলিম থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[২৩] হ্যাঁ, আমরা তাদের অনুসরণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। এখন তাদের উৎসব হয়েছে আমাদের উৎসব। যেমন- ভেলেন্টাইন্স ডে, এপ্রিল ফুল্স ডে, বাংলা নববর্ষ, ইংরেজী নববর্ষ ইত্যাদি। তাদের ভাষা হয়েছে আমাদের ভাষা। যেমন- প্রেসক্রিপশনের শুরুতে Rx, উৎসর্গ, ঐশী বাণী, ঈশ্বর, জলাঞ্জলী, তিলোত্তমা, দুধে ধোয়া তুলসি পাতা, দৈব বাণী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া ইত্যাদি শব্দগুলোর উৎসমূল খুঁজলে পরিষ্কার হয়ে যাবে এজাতীয় শব্দ মুসলমানদের বর্জন করা উচিত কি-না?

Rx : ব্যাবিলনীয় চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা দেবতা মারডাক-এর প্রতীক চিহ্ন রূপে তাদের প্রেসক্রিপশনে Rx লিখতেন। সেই ধারায় মুসলমান ডাক্তারগণও লিখেন। কখনো হয়তবা তারা অনুসন্ধান করে দেখেননি যে, Rx টি মূলতঃ কি জিনিস?

উৎসর্গ : দেবতার উদ্দেশ্যে কোন কিছু নিবেদন করা অর্থে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত এই শব্দটি। উৎসর্গ শব্দের পরিবর্তে আমরা হাদিয়া, উপহার, উপঢৌকন, নিবেদন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারি।

ঐশীবাণী : ঐশী শব্দের সাথে জড়িত যেমন- ঐশী গ্রন্থ, ঐশীবার্তা ইত্যাদি। বৈদিক ভাষার ঈশ্বর শব্দ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। আর ঈশ্বর কখনো আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ নয়।

তিলোত্তমা ও অপ্সরী : পরমা সুন্দরী বুঝাতে তিলোত্তমা, অপ্সরী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। হিন্দু শাস্ত্র মতে শব্দগুলোর অর্থ স্বর্গীয় বেশ্যা। জান্নাতে কোন বেশ্যা নেই। আছে ‘হূর’। ‘তাদেরকে আগে কখনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি’ *(আর-রহমান ৫৫/৭৪)*।

জলাঞ্জলী : জলাঞ্জলী হিন্দুদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মৃত ব্যক্তি পোড়ানোর পর হিন্দুরা প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে আঁজলাপূর্ণ পানি চিতায় ছিটিয়ে দেয়।

২৩. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।

তাদের ধর্মীয় এ কাজের নাম জলাঞ্জলি। হিন্দুদের জলাঞ্জলি নামের এই ধর্মীয় আচারটিই এখন বিসর্জন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড : হিন্দু সম্প্রদায়ের এক দেবতার নাম ব্রহ্ম। তাদের ধারণা তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মাণ্ড মানে ব্রহ্মের অণ্ড। তারা বিশ্বাস করে ব্রহ্মের অণ্ড থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শব্দটির ব্যবহার মুসলমানদের জন্য কতটা লজ্জাকর তা সহজেই অনুমেয়।

স্নাতক, স্নাতকোত্তর : স্নান শব্দটি হিন্দু শাস্ত্রের পরিভাষা। হিন্দুধর্মে বেদ বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে ছাত্ররা নির্ধারিত ধর্মশাস্ত্র পাঠ শেষ করলে নদীতে স্নান শেষে তাদেরকে পবিত্র করা হ'ত। অতঃপর দেয়া হ'ত স্নাতক উপাধি। হিন্দুদের ধর্মীয় আচারের এই শব্দই এখন মুসলমানদের সম্মানজনক ডিগ্রি সমূহের নাম!

আচার্য-উপাচার্য : বেদের ব্যাখ্যাকারী, বেদ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদেরকে প্রাচীনকালে আচার্য বলা হ'ত। সেই আচার্যই কি-না বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তি, যার অন্য কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই।

বিদ্যাপীঠ : পীঠ শব্দের অর্থ পূজা দেয়ার স্থান। মন্দির বা দেবালয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অথচ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বিদ্যাপীঠ।

এরূপ অজস্র শব্দ রয়েছে যেগুলো আমরা অহরহ ব্যবহার করছি জেনে না জেনে। এই জাতীয় শব্দগুলো মুসলমানদের যবানে ও কলমে আধিপত্য বিস্তার করেছে। অনেকে বলবেন এ জাতীয় শব্দ বর্জন করলে বাংলাভাষা গতি হারাবে। কখনোই না। হিন্দুদের ব্যবহৃত অনাকাংখিত শব্দগুলো কোন মুসলমান জেনেশুনে গ্রহণ বা ব্যবহার করতে পারে না। বাংলা শব্দ প্রয়োগে আমাদের আরো অভিধানমুখী, আরো অনুসন্ধানী হওয়া যরূরী। মুসলমানদেরকে হ'তে হবে ভিতর-বাহির উভয় দিক থেকে নিষ্কলুষ, নিরেট ও নির্ভেজাল। হ'তে হবে নিজ আদর্শে বলিয়ান। তবেই ইসলামী সংস্কৃতি সুদৃঢ় হবে, আলো ছড়িয়ে পড়বে অন্য সংস্কৃতির উপর। এই সংস্কৃতির মোহনীয় আবেদনে ভিন্ন সংস্কৃতির যৌবন ফিকে হয়ে যাবে।

আমাদের আহ্বান :

প্রিয় মুমিন ভাই ও বোনেরা! ভেবে দেখুন, নতুন বছরের কি মূল্য থাকবে যদি প্রাণপাখি পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়? শুভকামনায় প্রতিটি নববর্ষ উদযাপন করে পুরাতন বছর থেকে নতুন বছর কিছুটা এগিয়েছে কি? তবে কি স্বার্থকতা রয়েছে এই দিবস পালনে? আল্লাহ জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন

পরীক্ষা করার জন্য, কে সবচেয়ে বেশী সুন্দর আমল করে *(মুল্‌ক ৬৭/২)*। আসুন, আমরা আমলনামা সমৃদ্ধকরণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই।[২৪]

তরুণ-তরুণী ভাই ও বোনেরা! নিজেকে অবমূল্যায়ন করো না। তোমার মত যুবকের হাতে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। তোমার মত তরুণীরা বহু পুরুষকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছে। কেন তুমি ইসলাম থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? আনন্দকে শুধু প্রাধান্য দিয়ো না। তোমার যৌবন কি চিরকাল থাকবে?

প্রিয় অভিভাবক! আপনার স্নেহের সন্তানকে যে বয়সে রশি ছেড়ে দিয়েছেন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করতে, সে বয়সে মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ) গিয়েছিলেন ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণের বাসনায়। জানতে বড় ইচ্ছা হয়, যে মায়ের সন্তানেরা এমন লাগামছাড়া তাদের কি গর্ভধারণে কোন কষ্ট হয়নি? তবে কেন এত কষ্টের সন্তান এমন নিয়ন্ত্রণহীন? অথচ আপনার সন্তানের মত টগবগে যুবক-যুবতীর হাতেই ইসলাম সুদৃঢ় হয়েছে।

আপনার সচেতনতার অভাবে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হয়, তবে আপনি ব্যর্থ অভিভাবক। জেনে রাখুন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।[২৫] সুতরাং আসুন! সেদিন আসার আগেই আমরা সচেতন হই, যেদিন আমার সন্তান আমার জান্নাতের পথে বাধ্য হবে।

সমাপনী :

‘বর্ষবরণ’ অনুষ্ঠান ইসলামী শরী‘আতের সাথে সাংঘর্ষিক একটি অনুষ্ঠান। অথচ মুমিন জীবন এলাহী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে পালনীয় ছিল না, এমন কিছু এ যুগেও পালনীয় হ’তে পারে না। বর্ষবরণের এই অপসংস্কৃতির থাবায় পড়ে কত তরুণ-তরুণী যে জীবনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, তা দেখার কেউ নেই। সচেতন মুমিনদের উচিত বর্ষবরণের মতো এমন বেলেল্লাপূর্ণ এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় সর্বস্ব অনুষ্ঠান হ’তে বিরত থাকা এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের এই অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

---

২৪. আহমাদ হা/৫১১৪; আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান।
২৫. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।